ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 830-839
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.295

সমাজবাস্তবতার নিরিখে নির্বাচিত অসমীয়া গল্পকার ও গল্প: একটি বিশ্লেষণাত্মক পাঠ

ড. টিটন রুদ্র পাল, *সহকারী অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় সরকারি আদর্শ মহাবিদ্যালয়, অসম, ভারত*

Received: 25.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Although folktale-based narratives had been prevalent in Assam since ancient times, the true development of the Assamese short story began in the second decade of the twentieth century. From this period onward, Assamese short stories moved beyond mere narrative tradition and emerged in entirely new forms. In the early phase, as in other Indian literatures, literary activities in Assam developed around contemporary journals and periodicals. Most Assamese writers of that time began their literary careers by writing short stories in these publications.

In their stories, along with the depiction of various psychological conflicts within individuals, writers also portrayed contemporary social issues such as political instability, communal tensions, livelihood crises, frustration, and the struggle for survival with a strong sense of realism. The primary aim of this article is to present an outline of such contemporary social realities as reflected in Assamese short stories.

Considering the limitations of scope, this discussion remains concise. As a result, it has not been possible to include all Assamese short story writers in this article; instead, only selected writers and their works have been discussed. At the same time, Bengali translations of Assamese stories have been used as the primary source for this study. In this regard, the book titled *"Asamiya Galpa Sankalan"*, edited by Nirmalprabha Bordoloi and translated into Bengali by Sujit Chowdhury, has been used as the main source material for this research article. The present discussion follows a descriptive analytical method.

Keywords: Assamese writers, Assamese short story, reflect, social realities

সাহিত্যের অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন শাখাটির নাম হল ছোটোগল্প। আধুনিককালে ভারতীয় ছোটোগল্প বিশেষত বাংলা, অসমীয়া এবং হিন্দি সাহিত্যের গল্প পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবেই বিকাশ লাভ করেছিল। ধীরে ধীরে সে প্রভাব কাটিয়ে উঠে ভারতীয় গল্প সাহিত্য এক বিশেষ মাত্রা লাভ করেছে। আর এক্ষেত্রে অসমীয়া সাহিত্যের ছোটোগল্পও ব্যতিক্রম নয়। ঊনিশ শতকের শেষ দিকে বাংলায় রবীন্দ্রনাথ, হিন্দিতে কিশোরীলাল গোস্বামী এবং প্রেমচাঁদের হাত ধরেই এই দুই ভাষার ছোটোগল্পের যাত্রারম্ভ হয় নানা পত্র-পত্রিকাকে অবলম্বন করে। অসমীয়া ছোটোগল্পের জন্ম এবং বিকাশও সমকালীন অসমীয়া পত্র-পত্রিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। ১৮৯২ সালে 'জোনাকী' পত্রিকার চতুর্থ ভাগের চতুর্থ সংখ্যায় লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার 'সেঁউতী' গল্প প্রকাশের মধ্যদিয়ে অসমীয়া গল্প রচনার যাত্রা শুরু হয়। যদিও এর বহু আগে থেকেই আসামে লোককাহিনির আকারে

নানা গল্পের ধারা প্রচলিত ছিল। কিন্তু প্রকৃত অর্থে ছোটোগল্পের বিকাশ শুরু হয় বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে। এই সময় থেকেই অসমীয়া ছোটোগল্প শুধুমাত্র কাহিনি বর্ণনার পরম্পরা ছেড়ে সম্পূর্ণ নতুন ভঙ্গিতে প্রকাশ লাভ করে।

প্রথম দিকে ভারতের অন্যান্য ভাষার সাহিত্যের মতোই আসামের সাহিত্যচর্চাও সমকালীন নানা পত্র-পত্রিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। তাই অসমীয়া গল্প আলোচনার পূর্বে সমকালীন পত্র-পত্রিকার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন। অসমীয়া সাহিত্যের অগ্রগতিতে যে তিনটি পত্রিকার অবদান সবচেয়ে বেশি বলে উল্লেখ করা হয় সেগুলি হল, 'জোনাকী', 'আবাহন'এবং 'রামধেনু'। এইসব পত্র-পত্রিকায় তৎকালীন প্রায় সব অসমীয়া সাহিত্যিকরাই সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে হাতে খড়ি দিয়েছিলেন। সাহিত্যিক লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, শরৎ চন্দ্র গোস্বামী, সূর্যকুমার ভূঁইয়া, দণ্ডীনাথ কলিতা, লক্ষ্মীধর শর্মা, রমা দাশ, সৈয়দ আব্দুল মালিক, নগেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, ত্রৈলোক্য নাথ গোস্বামী, হেম বরুয়া, হলীরাম ডেকা, নকুল চন্দ্র ভূঁইয়া, মহীচন্দ্র বরা, বীণা বরুয়া, দীননাথ শর্মা, উমা শর্মা, সুপ্রভা গোস্বামী, প্রেম নারায়ণ দত্ত, মুনীন বরকটকী, বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য, মহিম বরা, যোগেশ দাস, সৌরভ কুমার সলিহার, হোমেন বরগোহাঞি, নগেন শইকীয়া, শীলভদ্র, মামণি রয়সম গোস্বামী, অপূর্ব শর্মা, প্রণবজ্যোতি ডেকা, হরেকৃষ্ণ ডেকা, ফণীন্দ্র কুমার দেবচৌধুরী, দেবব্রত দাস, অরূপা পটংগীয়া কলিতা, মনোজ কুমার গোস্বামী, বিপুল খাটনিয়া, ভূপেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য, জ্যোতিষ শিকদার, অরুণ গোস্বামী, মদন শর্মা, মৌসুমী কন্দলি, প্রশান্ত কুমার দাস, বিতোপন বরবরা, অনামিকা বরা, চন্দনা পাঠক, অপু ভরদ্বাজ, সোমনাথ বরাই, মৃণাল কলিতা, সপোনজ্যোতি বরঠাকুর, মণিকুন্তলা ভট্টাচার্য, গীতালি বরা, মণিকা দেবী, রশ্মিরেখা ভূঞা, সুরঞ্জনা শর্মা, বন্তি শেনচোবা, মৃত্যুঞ্জয় মহন্ত, অরূপ কুমার নাথ, সঞ্জীব পল ডেকা, সিদ্ধার্থ শঙ্কর বেজবরুয়া, প্রার্থনা শইকীয়া, মনালিসা শইকিয়া, অতনু ভট্টাচার্য প্রমুখ গল্পকার গল্প রচনা করে অসমীয়া গল্প সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের গল্পে মানুষের মনের বিভিন্ন দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পাশাপাশি নানা রাজনৈতিক অস্থিরতা, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, জীবিকা-সমস্যা, হতাশা, টিকে থাকার লড়াই ইত্যাদি সামাজিক সমস্যার কথাও বাস্তবতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। অসমীয়াগল্পে প্রতিফলিত এইসব সমকালীন সমাজ চিত্রের একটি রূপরেখা তুলে ধরাই আলোচ্য নিবন্ধের মূল লক্ষ্য। পরিসর বিস্তারের কথা মাথায় রেখে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ব্রতী হয়েছি। ফলে অসমীয়া সাহিত্যের সব গল্পকারদের গল্প এই নিবন্ধে তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। নির্বাচিত কয়েকজন গল্পকার ও তাঁদের গল্পই আলোচ্য নিবন্ধে স্থান দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে আমরা অসমীয়া গল্পের বাংলা অনুবাদকেই এই নিবন্ধ রচনার প্রাথমিক উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছি। এক্ষেত্রে নির্মলপ্রভা বরদলৈ সম্পাদিত এবং সুজিৎ চৌধুরীকৃত বাংলায় অনুদিত "অসমীয়া গল্প সঙ্কলন" শীর্ষক গ্রন্থ এই গবেষণা নিবন্ধের প্রাথমিক উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। বক্ষ্যমাণ আলোচনায় সাধারণ বর্ণনাধর্মী বিশ্লেষণ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে।

সাহিত্য দেশ, কাল ও সমাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। ফলে বহু বিচিত্র সামাজিক পরিস্থিতি, রাজনৈতিক কার্যকলাপ, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, স্বাধীনতালাভ ও স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের নানা সমস্যা ও ঘটনা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো অনেক গল্পেরই মূল বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। আমাদের চারপাশের প্রতিনিয়ত ঘটে চলা নানা সামাজিক ঘটনাসমূহ বহু গল্প রচনার মূল প্রেরণা হিসাবে লেখকদের মনের ভিতরে কাজ করে যায়। আর এই চিরপরিচিত সমাজের নানা ঘটনা তথা সমস্যার কথা নিয়ে গল্প রচনা করেছেন আসামের অনেক গল্পকার। আসামের স্বনামধন্য লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়াই অসমীয়া সাহিত্যে ছোটোগল্পের প্রথম রূপকার হিসাবে প্রসিদ্ধ।[১] তাঁর জন্ম ১৪ই অক্টোবর ১৮৬৪ সালে আসামের শিবসাগর অঞ্চলে, মৃত্যু ১৯৩৮ সালের ২৬ মার্চ। তিনি শিবসাগর থেকে বিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক

ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীকালে সাহিত্যসেবায় ব্রতী হন। তাঁর সাহিত্য সাধনার দিকে লক্ষ করে অনেকেই তাঁকে অসমীয়া সাহিত্যের রোমান্টিক ভাবধারার প্রথম পথপ্রদর্শক হিসাবে চিহ্নিত করে থাকেন। তিনি 'জোনাকি' ও 'বাহী' নামক সাহিত্য পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। আসামের জাতীয় সংগীত হিসাবে পরিচিত 'অ মোর আপনার দেশ' সংগীতটি তাঁর সুদক্ষ লেখনীর নিদর্শন। তাঁর চরিত্র গ্রন্থরাজির মধ্যে 'জোনবিবি', 'সুরভি', 'কদমকলী', 'পদুম কুঁয়রী', 'বরবরুয়ার কাকতর টোপলা', 'বরবরুয়ার ওভতনি', 'বরবরুয়ার ভাবর বুরবুরানি', 'কামর কৃতিত্ব লাভের সঙ্কেত', 'লিটিকাই', 'পাচনি', 'সাধুকথার কুফি', 'জয়মতী কুঁয়রী', 'চক্রধ্বজ সিংহ', 'চেলিমার', 'কাকা দেউতা নাতিলরা', 'ভাঙ্গীয়া দীননাথ', 'বেজবরুয়ার জীবনচরিত', 'শঙ্করদেব', 'ভগবৎ কথা', 'তত্ত্বকথা', 'শ্রীকৃষ্ণকথা', 'মোর জীবনের সোয়রঁণ' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও তিনি একাধারে কবিতা,ছোটোগল্প, উপন্যাস, নাটক, রঙ্গ-ব্যঙ্গমূলক প্রবন্ধ রচনা করে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। হাস্যরসের অসাধারণ কিছু প্রবন্ধ রচনা করে তিনি জনসাধারণের কাছে 'রসরাজ' নামে খ্যাত হন। তবে ছোটোগল্প রচনায় তাঁর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশি। তাঁকে অসমীয়া গল্প সাহিত্যের ভগীরথও বলা হয়। লেখক লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া অসমীয়া ছোটোগল্প সাহিত্যে যে নতুন ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসেন তা আজও শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত। তাঁর গল্পের কাহিনি বয়নে অবলীলাক্রমেই চলে আসে আমাদের আশেপাশের সামাজিক নানা প্রতিচ্ছবি। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গল্পের নাম হল 'জলকন্যা'। আলোচ্য গল্পটি পরিসরে ছোটো হলেও এর কাহিনি বয়নে নিহিত আছে আমাদের সমাজের গভীর এবং নির্মম সত্য কথাটি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের অনেক ক্ষেত্রেই যে অবদমিত করে রাখা হয়, অন্তঃপুরের চারদেওয়ালের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ করে রাখা হয় সে কথাই এই গল্পে উঠে এসেছে। আলোচ্য গল্পে আমরা দেখি প্রকৃতিপ্রেমী বাঁধনহারা নাম নাজানা মেয়েটি যখন বুঝতে পারে যে তাকে বিয়ে দেওয়া হবে, তখন থেকেই সে যেন জড়সড় হয়ে পড়ে। কারণ সে ছিল বনের সেই পাখিটির মতো বাঁধন ছাড়া, একেবারেই মুক্ত।বিবাহের প্রতি তার মনে একপ্রকার ভীতি কাজ করে। কারণ সে হয়তো আশেপাশের সামাজিক পরিবেশে দেখতে পেয়েছে যে বিয়ের পর মেয়েদের অপ্রত্যাশিতগৃহবন্দি জীবন। সমাজে প্রচলিত এই অসম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করারও তার সাধ্য নেই। তাই একপ্রকার অসহায়ের মতোই আত্মসমর্পণ স্বরূপ আলোচ্য গল্পের শেষে সে তার ভাবী বরকে বলে,

"আমি ময়না পাখী, খাঁচায় ঢুকিয়ে রাখবে, নিয়ে চলো।"[২]

আসলে মানবসভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে আদিম যুগে কোনো পরিবার ছিল না। মানুষের তখন প্রধান লক্ষ্য ছিল খাদ্য সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করা। আর এক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষ উভয়ে মিলে মিশেই খাদ্য সংগ্রহ করতো। ফলে সেখানে নারী এবং পুরুষের মধ্যে কেউ আলাদা করে বিশেষ মূল্য পেতো না। পুরুষের সঙ্গে নারীরা খাদ্য সংগ্রহের পাশাপাশি সন্তানও প্রতিপালন করতো। ফলে তখন নারীদের কাজ এবং দায়দায়িত্ব অনেকটাই বেশি ছিল।কিন্তু ধীরে ধীরে পরিবারের উদ্ভব হল। আর এই পরিবার থেকেই পিতৃতন্ত্রের উদ্ভব হয়। তখন থেকেই নারীদের গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়া হয়। নারীরা হয়ে পড়ল পুরুষের অধীনস্থ। বর্তমান সময়ের তুলনায় আদিম সমাজে নারীদের স্থান যে উপরে ছিল এপ্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচক বলেছেন,

> "আদিম মানব সমাজে কোন পরিবার ছিল না। অরণ্যবাসী মানুষ অরণ্য সম্পদের উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করতো। পুরুষ শিকার করতো আর নারীরা আহরণ করতো ফলমূল। নারীদের অপর কাজ সন্তান ধারণ ও সন্তান জন্মদান ও প্রতিপালন। তাই নারীরা ছিল একদিকে প্রতিপালিকা অন্যদিকে জীবনদাত্রী। তাই আদিম সমাজে নারীর স্থান ছিল উচ্চে।"[৩]

কিন্তু ধীরে ধীরে সমাজে নারীদের উপর নানা বিধি-নিষেধ আরোপ করে তাদের গণ্ডিবদ্ধ করে রাখা হল। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অনেকক্ষেত্রে নারীদের যেভাবে পদদলিত করা হয় সে দিকটিকেই লেখক আলোচ্য গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন।

অসমীয়া ছোটোগল্পের জগতে একটি সুপরিচিত নাম হল সাহিত্যিক লক্ষ্মীধর শর্মা। ১৮৯৮ সালে আসামের তেজপুরের ভীর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ছোটোবেলা থেকেই তিনি ছিলেন মেধাবী। শিক্ষাজীবন শেষ করে তিনি জনসেবার পাশাপাশি সাহিত্য সেবায় মনোনিবেশ করেছিলেন। কিছু কবিতার পাশাপাশি তাঁর সাহিত্য নিদর্শনগুলির নাম হল, 'ব্যর্থতার দান', 'অনাগতের অভিশাপ', 'নির্মলা', 'দেশের কথা', 'নিষ্ঠা আরু জীবনস্মৃতি' ইত্যাদি গ্রন্থ। এই সাহিত্যসেবীর অকালপ্রয়াণ ঘটে ১৯৩৪ সালে। মুক্তিযুদ্ধের বিপ্লবী বীর লক্ষীধর শর্মা অহিংস মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে জনসাধারণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁর রচিত অনেক গল্পে আমাদের চারপাশের মানুষের নানা দুঃখ, দুর্দশার কথা উঠে এসেছে। এধরনের বিষয় নিয়ে রচিত তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গল্পের নাম হল 'সিরাজ'। এই গল্পে আমাদের সমাজের কয়েকটি দিক লক্ষ করা যায়। গল্পের অন্যতম চরিত্র সাবিত্রির মাজীবনের প্রথম দিকে তাঁর ভাইদের অনেক সেবা যত্ন করেছিল। কিন্তু সাবিত্রির বাবার মৃত্যুর পর তারা তাঁকে সাহায্য করেনি, বরং তাঁকে দেখে তারা একপ্রকার এড়িয়ে চলেছে। আসলে আমাদের সমাজে এখনো কোথাও কোথাও কন্যা সন্তানকে পরিবারের বোঝা হিসাবেই গণ্য করা হয়। আর এই মানসিকতারই বাস্তব দৃষ্টান্ত আলোচ্য গল্পে লক্ষ করা যায় এইভাবে,

> "সাবিত্রীর মা ভেবেছিল সুখের দিনে নিজের ভাইদের সে যত্নআত্যি করেছে, দুঃখের দিনে আজ তারা তাকে বুকে তুলে নেবে। কিন্তু বাস্তবে বিপরীতটাই ঘটল। গাঁয়ের সবাই তাঁকে দেখলেই সরে সরে থাকে।"[৪]

আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে কন্যা সন্তানকে অনেক ক্ষেত্রেই অবাঞ্ছিত অতিথি হিসেবে ধরা হয়। তাই কন্যা সন্তানের জন্ম অনেক মা-বাবার কাছেই আকস্মিক দুঃসংবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষের মধ্যে এরূপ ধারণার জন্ম দিয়ে গেছে কিছু ধর্মীয় গ্রন্থ। ধর্মই সমাজকে প্রাচীনকাল থেকে কন্যা সম্পর্কে কতগুলি হীন মূল্যবোধ দ্বারা বীতস্পৃহ করে রেখেছে। আর পুত্রকে করেছে মানুষের কাছে পরম কাম্য। পুত্র কামনায় আমাদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ অথর্ব সংহিতায় বলা হয়েছে,

> "হে নারী, তুমি পুত্র সন্তান উৎপন্ন কর, সে উৎপন্ন পুত্রের পরও পুত্র উৎপন্ন কর। এরূপ অবিচ্ছেদে জাত পুত্রদের তুমি মাতা হও।"[৫]

কন্যার তুলনায় পুত্র সন্তান এতই কাঙ্ক্ষিত যে কোনো স্ত্রী যদি শুধু কন্যা সন্তান জন্ম দেয় তাহলে সেই অপরাধে তাকে ত্যাগ করা যায় এবং পুত্রের জন্য পুরুষ দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে। আর এর নির্দেশ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ আছে এইভাবে,

> "স্ত্রী যদি কেবল কন্যাই প্রসব করে, তবে স্বামী দ্বাদশ বৎসর প্রতীক্ষা ক'রে (পুত্র প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা ক'রে) দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারবে।"[৬]

আর ধর্ম গ্রন্থে উল্লিখিত এধরনের নানা নির্দেশ পরবর্তীকালে আমাদের সমাজের মানুষের মনে খারাপ প্রভাব ফেলেছে। কারণ কন্যা সন্তানের প্রতি অনাদরের বহু চিত্র প্রতিনিয়ত আমাদের সমাজে লক্ষ করা যায়। আলোচ্য গল্পে তারই প্রতিফলিত চিত্র দেখা যায়। তাছাড়া আমাদের সমাজে দুষ্ট ক্ষতের মতো বিরাজ করা জাতিভেদ প্রথার কথাও আলোচ্য গল্পে উঠে এসেছে। আলোচ্য গল্পের মুখ্য চরিত্র কন্দর্প তাদের বাড়িতে আশ্রিতা সাবিত্রীকে ভালোবেসে জীবন সঙ্গী করতে চেয়েছিল। কিন্তু কন্দর্পের মা বাবা সে সম্পর্ক মেনে নিতে নারাজ। কারণ তাঁদের মতে সাবিত্রীর মায়ের বংশ পরিচয় তথাকথিত নীচু স্তরের, তাছাড়া তারা কন্দর্পদের

বাড়িতে আশ্রিতা মাত্র। তাদের তথাকথিত সমাজের বংশ মর্যাদা দূরের থাক নিজেদের থাকার জায়গা পর্যন্ত নেই। তাই তাঁদের পরিবারের সঙ্গে সাবিত্রীদের মেলবন্ধন সম্ভব নয়। তাইতো কন্দর্পের বাবা বলেন, "ছোটলোকের সঙ্গে সংশ্রব রাখাটাই ভুল হয়েছিল।"[৭] শুধু তাই নয় গল্পের অগ্রগতিতে আমরা দেখতে পাই সমাজে নিন্দার ভয়ে সাবিত্রীর গর্ভের সন্তানকে বিষ পানে হত্যার চেষ্টাও করা হয়। কিন্তু সাবিত্রী সে যাত্রায় সেখান থেকে পালিয়ে প্রাণে বাঁচে। আশ্রয় পায় সমাজসেবী মুসলমান সিরাজের ঘরে। সেখানে সাবিত্রী এক কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করে। সিরাজ আদর করে তার নাম রাখলেন নূর। কিন্তু যেহেতু সে একজন হিন্দুর সন্তান তাই তার অন্য নাম রাখলেন সীতা। ঘটনাক্রমে পরবর্তীতে কন্দর্প তার সন্তান সীতার সঙ্গে পরিচয় ঘটে। ধীরে ধীরে কন্দর্পের তত্ত্বাবধানে সীতা বড়ো হয়ে পড়াশুনা সম্পূর্ণ করে। অবশেষে তার বিবাহের সম্বন্ধ আসে সমাজের তথাকথিত উঁচু শ্রেণির পাত্র ও তার ভালোবাসার মানুষ অনিলের। কিন্তু অনিল যখন জানল সীতার জন্ম হয়েছে গরীবের ঘরে এবং মুসলমানের ঘরে প্রতিপালিত হয়েছে তখন সে বেঁকে বসে। তার কথা থেকে বুঝা যায় এই বেঁকে বসার একটি কারণ হল জাতপাতের ভেদাভেদ। আর অন্য কারণ হল সীতা একজন পিতৃ পরিচয়হীনা কন্যা। আলোচ্য গল্পে এই দিকগুলি উঠে এসেছে অনিলের মুখদিয়ে এইভাবে,

> "যে মেয়ের জন্ম চাকরানীর গর্ভে, আর সে মানুষ হয়েছে মুসলমানের ঘরে, আমার ইচ্ছা থাকলেও তেমন মেয়েকে আমার মা-বাবা কোনোদিনই ঘরে তুলবেন না।"[৮]

সমাজের রক্ত চক্ষুর ভয়ে কীভাবে একটি সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় তা এই গল্পে বাস্তবতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। এই গল্প সম্পর্কে সমালোচক বিরিঞ্চি কুমার বরুয়া তাঁর বিখ্যাত 'অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন,

> "'সিরাজে'-এ পাই—সীতা ও অনিলের মধ্যে যে প্রেমের ফুল ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছিল, তা হঠাৎ ঝরে পড়ল, কারণ অনিল সমাজের চোখ রাঙানির ভয়ে ভীত। সমাজ-পতিরা খবর জোগাড় করেন যে সীতা বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর কন্যা নয়।"[৯]

নারীর বিড়ম্বনাময় জীবন-চিত্র অঙ্কিত হয়েছে লেখক ত্রৈলোক্য নাথ গোস্বামীর কিছু ছোটোগল্পে। আসামের এই স্বনামধন্য গল্পকারের জন্ম ১৯০৩ সালে আসামের নলবাড়িতে। পেশায় তিনি ছিলেন অধ্যক্ষ। আজীবন তিনি সাহিত্য সাধনায় ব্রতী ছিলেন। একাধারে তিনি বহু গল্প ও উপন্যাস লিখে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ছোটোগল্প সংকলনগুলির নাম হল, 'অরুণা', 'মরীচিকা', 'শিল্পীর জন্ম'। তাঁর উল্লেখযোগ্য একটি ব্যঙ্গমূলক উপন্যাসের নাম হল 'জীয়া মানুহ্'। তাঁর রচিত আলোচনামূলক গ্রন্থের নাম হল, 'সাহিত্য আলোচনা' এবং 'আধুনিক গল্প সাহিত্য'। দ্বিতীয় গ্রন্থটির জন্য সাহিত্য আকাদেমির দ্বারা তিনি পুরস্কৃত হন। ৮২ বছর বয়সে এই সাহিত্যিকের মৃত্যু ঘটে ১লা ডিসেম্বর ১৯৮৮ সালে। তাঁর উল্লেখযোগ্য একটি গল্পের নাম হল 'পতিত এবং পতিতা'।

আলোচ্য গল্পে নারীর বিড়ম্বনাময় জীবন-চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। গল্প বর্ণনায় আমরা দেখি খাউন্দদের বাড়িতে একজন বিধবা মহিলা থাকেন। অকালে স্বামী মারা যাওয়াই বাড়ির সকলে তাঁকে নানাভাবে গঞ্জনা দিতে থাকে। শাশুড়ি ভাবে এই বিধবা নারী পাপীয়সী। তাঁর পাপের ফলেই বাড়ির মেঝো ছেলের মৃত্যু হয়েছে। শুধু তাই নয় এই বাড়িতে যা কিছুই অমঙ্গল ঘটে সব দোষ এসে পড়ে এই অসহায় বিধবার উপর। শাশুড়ি কথায় কথায় তাঁকে তিরস্কার করে বলেন, "পাপীয়সী এসেই মেজ ছেলেটিকে খেয়েছিস। আর কি যে করবে, কে জানে।"[১০] প্রতিনিয়ত এইভাবে তিরস্কার শুনতে শুনতে তাঁর জীবনটাই যেন দুর্বিষহ হয়ে উঠে। তাইতো তিনি জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে বলেন,

> "বাড়ির সবাইর আমি চক্ষুশূল। দিনরাত আমার ভাগ্যে শুধু গালাগালিই জোটে। আমার বেঁচে থাকার দরকার নেই। সংসার আমার কাছে বিষ হয়ে উঠেছে।"[১১]

আসলে আমাদের সমাজের কিছু বদ্ধমূল ধারণা আছে যে কোনো মঙ্গল কাজে বিধবাদের ডাকতে নেই। বিধবাদের উপস্থিতিই যেন একপ্রকার অমঙ্গলকর। আর এই ধারনার বশবর্তী হয়ে অনেক পরিবারই তাদের উপরনানাভাবে উৎপীড়ন এবং শোষণ করতে থাকে। আমাদের সমাজে এধরনের দৃশ্য প্রতিনিয়তই কোথাও না কোথাও দেখতে পাওয়া যায়। বিধবাদের নানাভাবে অত্যাচারের ফলে তাদের জীবন যে দুঃখ-কষ্টে ভরে উঠেতারই বাস্তব চিত্র গল্পকার এই গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন।

হেমেন বরগোহাঞি অসমীয়া সাহিত্য জগতে এক সুপ্রসিদ্ধ নাম। ১৯৩২ সালের ৭ই ডিসেম্বর আসামের লক্ষ্মীমপুরে তাঁর জন্ম। ছোটোবেলা থেকেই তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে কটন কলেজ থেকে তিনি স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর পেশা ছিল শিক্ষকতা আর নেশা ছিল সাহিত্যচর্চা। আসাম সিভিল সার্ভিসেও তিনি তেরো বছর কর্মরত ছিলেন। পাশাপাশি প্রথমে 'শান্তিদূত' পত্রিকার সহ-সম্পাদক এবং পরবর্তীতে সাপ্তাহিক 'নীলাচল' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। এই পত্র-পত্রিকার হাত ধরেই তিনি সাহিত্য জগতে পদার্পণ করেন। তিনি একাধারে যশস্বী কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক ও সমালোচক ছিলেন। পাঁচটি গল্পসংকলন, তিনটি উপন্যাস, দুটি প্রবন্ধ গ্রন্থ তাঁর সাহিত্য নিদর্শন, যার দ্বারা তাঁর সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। 'অসম সাহিত্য সভা'-এর দ্বারা প্রকাশিত 'কুড়ি শতিকার অসমীয়া সাহিত্য' নামক গ্রন্থটি তিনি সম্পাদনা করেছেন। ১৯৭৮ সালে তাঁর রচিত উপন্যাস 'পিতা পুত্র'-এর জন্য তিনি সাহিত্য একাডেমী পুরস্কারে ভূষিত হন। এই বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি করোনা রোগে আক্রান্ত হয়ে সম্প্রতি(১২ই মে ২০২১) মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গল্পের নাম হল 'পর্দা'।

আলোচ্য গল্পে আমাদের সমাজের নির্মম সত্যটি বর্ণিত হয়েছে। সমাজে যারা দেহোপজীবিনী থাকে তাদের সম্পর্কে আমাদের অনেকের মনেই বিরূপ ভাবনা কাজ করে। তাদের নানা ক্ষেত্রে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। অথচ একবারও আমরা ভাবিনা যে তাদের জীবিকার এই পথ বেছে নেবার কারণ কী? কিংবা তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে ইচ্ছা করেকিনা তা জানার চেষ্টা পর্যন্ত করা হয়না। আমাদের চোখে তারা এক প্রকার সমাজের অচ্ছুৎ।আবার এমনও দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে কোনো স্বহৃদয়বান মানুষ যদি তাদের মধ্যে কাউকে ভালোবেসে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে চায় তাহলেও বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় আমাদের কঠোর সমাজব্যবস্থা। ঠিক এধরনেরই কাহিনি নিয়ে রচিত এই 'পর্দা' গল্পটি। আলোচ্য গল্পে আমরা দেখি পেরেরার বর্ণিত কাহিনিতে যে বারাঙ্গনার কথা বর্ণিত আছে তার নাম রানী। রানীকে ভালোবেসে অশোক তাকে নিয়ে সংসার করতে চেয়েছিল।কিন্তু সমাজের লোকলজ্জার ভয়ে সে তাকে নিজের বাড়িতে তুলতে রাজি হয়নি। তার মনের সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বপ্রকাশ পায় আলোচ্য গল্পে এইভাবে,

> "রানীর প্রেমে পড়ে অশোক প্রথমে তাকে জীবনসঙ্গিনীইকরতে চেয়েছিল। কিন্তু সরকারি পদমর্যাদা, সামাজিক সম্মান আর সহজাত সংস্কার – এগুলোর চাপে শেষ পর্যন্ততা আর হয়ে ওঠে নি।"[১২]

এইভাবে সামাজিক অনুশাসনের দ্বারা জর্জরিত ও সঙ্কুচিত হতে হতে আলোচ্য গল্পের রানীর মতো আমাদের সমাজের বহু নারীর জীবনই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। সমাজের এই নির্মম সত্যটি আলোচ্য গল্পের গল্পকার অতি সাধারণ অথচ গভীরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রকৃতপক্ষে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নানা সামাজিক অনুশাসনে সবচেয়ে বেশি অত্যাচার আর বঞ্চনার শিকার হয় নারীরা। অথচ মাতা রূপে, কন্যা রূপে, জায়া রূপে, বধূ রূপে স্নেহ মায়া-মমতা এবং কর্তব্যনিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দিয়ে পারিবারিক সুখ-সুবিধা, শান্তি-শৃঙ্খলা

বিধানের গুরুদায়িত্ব পালন করে থাকে নারী। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অতি প্রাচীনকাল থেকেই নারীকে নানা অনুশাসন এবং উপদেশ দিয়ে তাকে গণ্ডিবদ্ধ করে বঞ্চনা করা হয়েছে। মহাভারতে দেবী পার্বতীর মুখ দিয়ে স্ত্রী-ধর্ম কথিত হয়েছে এইভাবে,

> "যিনি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহমার্জন, গৃহ গোময়লেপন, স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া হোমানুষ্ঠান, বলিপ্রদান এবং দেবতা, অতিথি ও ভৃত্যগণকে আহার প্রদান করিয়া থাকেন, পরিবারবর্গ ভোজন করিলে পর যিনি ভোজনে প্রবৃত্ত হয়েন, যাহার দ্বারা লোকসকল সন্তুষ্ট ও পরিতুষ্ট হয় এবং যিনি শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সন্তোষসাধন, পিতামাতার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করেন, তাহার অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম লাভ হয়।"[১৩]

অর্থাৎ গৃহকর্মে নিপুণা এবং সকলের প্রতি সেবা শুশ্রূষা করার মতো নারীই সকলের কাম্য। আবার মানবশাস্ত্রাকার মনু বলেছেন,

> "শীলরহিত, পরদাররত, বিদ্যাদি গুণবর্জিত হইলেও পতিকে উপেক্ষা না করিয়া সাধ্বী স্ত্রী সর্বদা দেবতার ন্যায় তাহার সেবা করিবেন।"[১৪]

অর্থাৎ স্বামী যতই অযোগ্য হোক না কেন স্ত্রী স্বামীকে দেবতার মতো ভক্তি করবে। এইরকম নানা উপদেশ, নির্দেশ অনুশাসন দ্বারা সংসার যাত্রা নির্বাহের ক্ষেত্রে নারীকে স্বেচ্ছাচারী স্বামীর এক প্রকার দাসী রূপে প্রতিপন্ন করেছে শাস্ত্র। আবার স্ত্রী যাতে স্বামীর একান্ত অনুগত থাকে সেই উদ্দেশ্যে নারীকে নানাভাবে ভীতি প্রদর্শনও করেছে শাস্ত্র। এ প্রসঙ্গে স্কন্দ পুরাণে উল্লেখ আছে,

> "যে নারী স্বামীকৃত ভৎসনা রোষপরবশ হইয়া তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করে, সে পরজন্মে গ্রাম্য-কুক্কুরী ও বন্য শৃগালী হয়।"[১৫]

কিন্তু শাস্ত্রের এইসব ভীতি নির্দেশ পূর্বে নারীদের দমন করে রাখলেও আধুনিক চিন্তা-চেতনায় জাগ্রত নারীরা বর্তমানে তা মানতে নারাজ। তাদের সঙ্গে যে নানা অত্যাচার আর বঞ্চনা ঘটছে প্রতিনিয়ত, তার বিরুদ্ধে কিছু কিছু প্রতিবাদ এবং লড়াইয়ে সামিল হতেও দেখা যায় আধুনিক নারীদের। তারা পূর্বের সব অন্যায় আরোপিত গণ্ডিবদ্ধ জীবন-শৃঙ্খল ছিন্ন করে বেড়িয়ে আসতে চেষ্টা করছে। আধুনিক নারীর এই ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সাহিত্যেও প্রতিফলিত হয়েছে বাস্তবসম্মতভাবে। অসমীয়া সাহিত্যিক লক্ষ্মীনাথ ফুকন তাঁর 'বিহু সম্মিলন' গল্পে আধুনিক নারীদের এইসব নানা বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। আলোচ্য গল্পের অন্যতম চরিত্র বিচিত্রময়ী শুধু গার্হস্থ্য জীবনেই নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখেননি, তিনি সভানেত্রী হিসাবে নানা সভায় জনসাধারণের সামনে ভাষণ দিয়ে থাকেন। প্রয়োজনে তিনি নানা রাজনৈতিক ছলচাতুরী করতেও পিছপা হন না। তিনি নেতৃত্ব দিয়ে গ্রামের সকলের মন জয় করার চেষ্টা করেন। গ্রামে বিহু সম্মিলনের সমস্ত দায়-দায়িত্ব নিজে সামলানোর পাশাপাশি পারিবারিক দায়িত্বও সমানভাবে পালন করেন তিনি। আসলে যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্রাম্য সমাজেও যে আধুনিক চিন্তা-চেতনার দোলা লাগে তারই বাস্তবসম্মত বর্ণনা আলোচ্য গল্পে পরিস্ফুট হয়েছে।

সাহিত্যিক লক্ষ্মীনন্দন বরা অসমীয়া সাহিত্যজগতের এক উজ্জ্বল নাম। ১৯৩২ সালে আসামের নগাঁওঅঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। করোনা মহামারীর করালগ্রাসে সদ্যপ্রয়াত(৩রা জুন ২০২১) হন তিনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় এম.এস.সি পাশ করে তিনি অসমের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন। তাঁর নয়টি উপন্যাস ও এগারোটি গল্প সংকলন রয়েছে। এছাড়াও তাঁর একটি নাটক এবং দুটি প্রবন্ধ গ্রন্থ রয়েছে যা

তাঁর লেখনীশৈলীর দক্ষতার পরিচয় বহন করে। তাঁর সামাজিক প্রেক্ষাপটে লেখা একটি উল্লেখযোগ্য গল্পের নাম হল 'গুরু পর্ব'।

আলোচ্য গল্পে পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক চাপে মানুষের মূল্যবোধ যে অবক্ষয় হচ্ছে সেই দিকটিকেই তুলেধরার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটি আচরণমূলক ধারণা হল মূল্যবোধ। মূল্যবোধ মানব আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর এই মূল্যবোধগুলিই সমাজের জীবনপ্রবাহের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। এই মূল্যবোধ সম্পর্কে বিশিষ্ট সমালোচক বলেছেন,

> "নিকটবর্ত্তী স্থূল সুখের চেয়ে দূরবর্ত্তী সূক্ষ্ম সুখকে, আরামের চেয়ে সৌন্দর্য্যকে, লাভজনক যন্ত্রবিদ্যাকে শ্রেষ্ঠ জানা এবং তাদের জন্য প্রতীক্ষা ও ক্ষতি স্বীকার করতে শেখা-এ-সবই মূল্যবোধের লক্ষণ; আর এ সকলের অভাবই মূল্যবোধের অভাব।"[১৬]

যুগ যুগ ধরে এই মূল্যবোধের দ্বারাই সমাজকাঠামো পরিচালিত হয়ে আসছে। সামন্ততন্ত্রের অধীনস্থ প্রাচীন এবং মধ্য যুগ সমস্তটাই ধর্মীয় মূল্যবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। মোটকথা এই ধর্মীয় মূল্যবোধই ছিল প্রাচীন এবং মধ্যযুগের সমস্ত কিছুর নিয়ামক শক্তি।[৩] এরপর ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যে গণতান্ত্রিক সমাজকাঠামোর যাত্রা শুরু হয়েছিল তারই ভিত্তিস্বরূপ সমাজমননে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মানবতাবাদী মূল্যবোধ। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং তার অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে সমগ্র বিশ্বে যে মহামন্দা, বিশৃঙ্খলা চলছিল তার প্রভাব থেকে ভারতবর্ষও রেহায় পায়নি। ভারতবর্ষেও তখন আশাভঙ্গের বেদনা এবং স্বপ্নভঙ্গের বিষণ্ণতা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ফলে মানুষের স্থির চিন্তার জগৎ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে প্রচলিত মূল্যবোধে ফাটল দেখা দিল। আর এর জন্য প্রধানভাবে দায়ী ছিল অবক্ষয়িত যুগের অব্যবহিত পরবর্তীতে মানুষের অসংযত জীবন-যাপন, সীমাহীন লোভ, আত্মসর্বস্ব ও আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব, অসৎ প্রবৃত্তি, অনৈতিক কাজকর্ম। একইসঙ্গে ধীরে ধীরে মানুষের মন থেকে নৈতিকতা, মানবিকতা এবং মনুষ্যত্ববোধের মত চিরন্তন লালিত সামাজিক মূল্যবোধগুলি হারিয়ে যায়। সমকালীন প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিশিষ্ট সমালোচক জানিয়েছেন,

> "লড়াইয়ের ফলে ইউরোপের যে দুরবস্থা ও মানুষের চিন্তাজগতে যতটা পরিবর্তন এসেছে, আমাদের দেশে তার চেয়ে অনেক কম হলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর তুলনায় আমাদের দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের পরিমাণ ও মনের ভাবধারার গতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। ..... বর্তমানে বাংলাদেশে জীবন সংগ্রামে যে কঠোর প্রতিযোগিতা চলেছে, তাকে মুখের গ্রাস নিয়ে কাড়াকাড়ি বললে অত্যুক্তি হয় না।দারিদ্র্যের তাণ্ডব নৃত্যের নিষ্ঠুর পদাঘাতে কোথায় উড়ে যাচ্ছে ধর্ম, সমাজ, স্বাস্থ্য আনন্দ, প্রাণ, আয়ু, ইহকাল পরকাল--সব।"[১৭]

আর এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব এ যুগেও লক্ষ করা যায়। ভারতীয় সমাজব্যবস্থাকে উপলব্ধি করলে বুঝতে পারা যায় যে এমন অনেক আদর্শ বা মূল্যবোধ রয়েছে যা দীর্ঘদিন ধরে আমরা কোনো না কোনো ক্ষেত্রে অনুসরণ করে আসছি। বিশেষত ত্যাগ, দান, নিষ্ঠা, সত্য, অহিংসা ইত্যাদি ভারতীয় সমাজব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আর এগুলির অব্যবহারই যে আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সামাজিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের বাস্তবসম্মত চিত্র আলোচ্য গল্পে লক্ষ করা যায়। এই গল্পে দেখা যায় গল্প কথক সরুমণিকে গ্রামে আয়োজিত নাটকের সূত্রধারের ভূমিকা পালন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তখন তার বাবা পারিশ্রমিক দিয়ে একজন গুরুকে রাখলেন তাকে সমস্ত গানের রাগ শেখানোর জন্য। কিন্তু গুরুদেবের পারিবারিক অবস্থা খুবই অসচ্ছল ছিল। তিনি সরুমণিকে যেসব গানের রাগকম সময়েই শেখাতে পারতেন তা শেখালেন অনেকটা সময় ব্যয় করে। এমনকি তিনি বিশেষ কিছু গানের নিয়ম

রেখে দেন পরবর্তীতে শেখাবেন এটা ভেবে। এর প্রধান কারণ তিনি জানতেন যে তাড়াতাড়ি গানের সব নিয়ম শিখিয়ে দিলে তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। তখন তারা আর তাঁকে ডাকবে না। ফলে গান শিখিয়ে যে পারিশ্রমিক পেয়ে তিনি সংসার চালাতেন সে আয়ের পথ তাঁর বন্ধ হয়ে যাবে। অর্থনৈতিক চাপে পড়ে তিনি এ পথ বেছে নিলেও গল্পের শেষে আত্মধ্বংসনে দগ্ধ হয়ে সে কথা স্বীকার করে নিয়ে তাদের কাছে বলেন,

> "এই ছেলেটিকে যে শিখিয়েছি, তাতে বিস্তর ফাঁকি থেকে গেছে। প্রথম মাসেই তাকে আরো ভাল ভাল জিনিস শিখিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু শেষে আমার বিষয় জর্জর পাপী মন বাদ সাধল। ... বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়েগুলির কি অবস্থা। শ্রাবণ মাসের পর ঘরে ধান একমুঠিও থাকে না। ... এই সময় আপনার অনুরোধে ছেলেটিকে শেখাতে গেলাম। ... তাতে কিছু সুরাহা হল। তখন একটা কথা মনে হতেই আমার মন পিশাচ হয়ে গেল। ... অনটনের দিনগুলির কথা ভেবে আমার মন যেন কি রকম হয়ে গিয়েছিল।"[১৮]

আসলে অর্থনৈতিক অভাব-অনটন কীভাবে মানুষের জীবনে নৈতিক অবনতি ঘটায় এই গল্পটি তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। একজন শিক্ষকের নৈতিক ও প্রধানদায়িত্ব হল তার ছাত্র-ছাত্রীদের নির্ভুল ও যথাযথ শিক্ষাদান করা। আর এই গুরুদায়িত্ব যখন কোনো শিক্ষক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র অর্থের অভাবে সঠিকভাবে পালন করতে পারে না তখনই দেখা দেয় সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়। আর এই মূল্যবোধ অবক্ষয়েরদিকটি আলোচ্য গল্পে বাস্তবসম্মতভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।

আমাদের সমাজের এই সব নানা দিক অসমীয়া গল্পকারগণ তাঁদের গল্পে শিল্পরূপ দান করেছেন। কারণ সাহিত্যিকের সমাজ বহির্ভূত কোন সত্তা নেই, তিনি তাঁর স্ব-কালের সামাজিক নানা পরিবর্তন ও বিবর্তনের ফসলেই পরিপুষ্ট হয়ে থাকেন। আর এর ফলে তাঁর সৃষ্টিতে সমকালের দিকচিহ্নের বিভিন্ন স্তরগুলি কোনো না কোনো ভাবে ফুটে উঠবেই, আর এটাই স্বাভাবিক। সমাজের পারিপার্শ্বিক যে নানা বিবর্তন ঘটে চলছে তার চিত্র সাহিত্যিক কখনো জ্ঞাতসারে আবার কখনো অজ্ঞাতসারে তাঁর রচনায় তুলে ধরেন। আর আসামের গল্পকারগণও সমকালের সামাজিক প্রেক্ষাপটকে তাঁদের গল্পগুলিতে বাস্তবতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। তাঁদের গল্পে আসামের গ্রাম-পাহাড়ের সমাজ চিত্রের পাশাপাশি শহরের সামাজিক অবস্থারও চিত্র উঠে এসেছে। সমাজে ঘটমান জাতিবিদ্বেষ, হিংসাত্মক কার্যকলাপ, রাজনীতির নানা কুটিল চক্রান্ত, সবলের দ্বারা দুর্বলের উপর অত্যাচার, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ইত্যাদি নানা সমস্যার কথা তাঁদের লেখায় ফুটে উঠেছে। একইসঙ্গে আমাদের সমাজে নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থানের চিত্রও তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সামাজিক নানা বিধি-নিষেধের কারণে কিংবা নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে অনেক ক্ষেত্রেই নারীর জীবনে যে বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয়, সে সব দিকও লেখকগণ আসামের সামাজিক প্রেক্ষাপটের নিরিখে বিশ্বাসযোগ্য করে গল্পগুলিতে উপস্থাপন করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. বরুয়া, বিরিঞ্চিকুমার। 'অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাস', দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৪, সাহিত্য অকাদেমি, পৃষ্ঠা. ১৯৯।
২. বরদলৈ, নির্মলপ্রভা (সম্পা.)। 'অসমীয়া গল্প সঙ্কলন', প্রথম প্রকাশ, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নয়াদিল্লি, পৃষ্ঠা. ৩।
৩. দে, বিদ্যুৎবিকাশ। 'উনিশ শতকের নারীসমাজ ও বিদ্যাসাগর', ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃষ্ঠা. ২০।
৪. বরদলৈ, নির্মলপ্রভা। সম্পাদনা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫ ।

৫. বিহারী গোস্বামী, বিজন। অনুদিত ও সম্পাদিত, 'অথর্ববেদ সংহিতা', ৩/৫/২, ১৯৭৮ সাল, পৃষ্ঠা. ৯৮।

৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু। অনুদিত ও সম্পাদিত, 'কৌটিলীয়াম্ অর্থশাস্ত্রম' (প্রথম খণ্ড), ৩/২/৭, ২০০২ সাল, পৃষ্ঠা. ৫০৫।

৭. বরদলৈ, নির্মলপ্রভা। সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৮।

৮. তদেব, পৃষ্ঠা. ১৬।

৯. বরুয়া, বিরিঞ্চিকুমার। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ২০৩।

১০. বরদলৈ, নির্মলপ্রভা। সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩৭।

১১. তদেব, পৃষ্ঠা. ৩৯।

১২. তদেব, পৃষ্ঠা. ১২১।

১৩. তর্করত্ন, পঞ্চানন। অনুদিত ও সম্পাদিত, 'মনুসংহিতা', ৫/১৫০, ১৯৯৩ সাল, পৃষ্ঠা. ৮৮।

১৪. তদেব, পৃষ্ঠা. ১৫১।

১৫. তর্করত্ন, পঞ্চানন। সম্পাদিত, 'স্কন্দ পুরাণ' (কাশী খণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়) ৩৬নং শ্লোক, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা. ২০৭১।

১৬. ইসলাম চৌধুরী, সিরাজুল। 'সংস্কৃতি-কথা', জুলাই ২০১৬, পৃষ্ঠা. ৩৭।

১৭. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। 'কালের পুত্তলিকা' (বাংলা ছোটগল্পের একশ' দশ বছর ১৮৯১-২০০০), অক্টোবর ২০১৬, পৃষ্ঠা. ১৭৯।

১৮. বরদলৈ, নির্মলপ্রভা (সম্পা.)। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ২৫১।